একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The Confliction of Indigenous Education and Modern Education in Swapnamoy Chakraborty's novel 'Chatushpathi'

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাসে দেশজ শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার দ্বান্দ্বিকতা

Name of the Author: **Sk Saklinuddin**

Affiliation: **Ex-Student-Bengali Department-Presidency University**

Abstract: Native education is a very ancient educational system, which enriched the people of ancient and medieval times in many ways. Especially before the Western education system, the influence and sky-high success of native education in Bengal has also marked the period of the seventeenth century as the culmination of the era of native education. However, due to the introduction of the British education system and the all-consuming influence of Western education, native education gradually became critical and marginalized. This tradition and culture, which was lost in the flow of time, has become relevant in Bengali literature in many ways. The Apur Pathshala in Bibhutibhushan Bandopadhyay's 'Pather Panchali', the life struggle of Sitaram Pandit in Tarashankar Bandopadhyay's novel 'Sandipan Pathshala' and the establishment of the Pathshala of Vrindavan in Sarat Chandra Chattopadhyay's novel 'Pandit Mashai', etc. Swapnamoy Chakraborty's novel 'Chatushpathi' is no exception. On the one hand, the hard life struggle of the old Anangmohan, who is constantly fighting to save his Chatushpathi and Sanskrit language from the clutches of modern education; on the other hand, the image of Anjali, who has lost faith in indigenous education and clings to modern education - is the root of this conflict. The article under discussion analyzes the crisis of indigenous education, the Chatushpathi-centric education system, and the conflict and conflict between traditional education and modern education.

Keywords: Swapnamoy Chakraborty, Indigenous Education, Modern Education, Chatushpathi, Sanskrit language

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাসে দেশজ শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার দ্বান্দ্বিকতা

সেখ সাকলিনউদ্দিন

‘স্বপ্নময়’ শব্দটির সাধারণ অর্থ স্বপ্ন বিজড়িত বা কাল্পনিক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন তিনিই হলেন স্বপ্নময়। ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাসের রচয়িতা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু স্বপ্নময়ের জীবন কল্পনা বা স্বপ্নে সজ্জিত নয়, খাপছাড়া বাস্তব জীবনের স্বাক্ষী। কারণ দেশভাগের যন্ত্রনার প্রভাব তাঁর পরিবারের উপর পড়েছিল। দেশভাগের ফলে পেশায় শিক্ষক পিতা হীরালাল চক্রবর্তী সপরিবারে কলকাতায় উঠে আসেন এবং বাগবাজারের একটা ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ মাত্র ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, মানবমন দেশভাগের কাঁচা ঘায়ে যখন ক্ষতবিক্ষত; ঠিক তখন মা সাধনা দেবীর সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রনার উপশম ঘটিয়ে জন্ম নিলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সময়টা ছিল ১৯৫১ সাল, ২রা জানুয়ারি। অনেকের মতে ১৯৫২ সালের ২৪ আগস্ট, এই মতানৈক্যের সূত্রপাত স্কুলে ভর্তির সময়। এপ্রসঙ্গে স্বপ্নময় নিজেই বলেছেন— “আমার জন্ম ১৯৫১ সাল। আমার আগে একটি সন্তান নষ্ট হয়। ফলে দেশজ সংস্কারে আমার জন্মের পর আমার একটা কানের লতি ফুটো করে খুঁত যুক্ত করে দেওয়া হয়, যেন আমি যমের নজরে না পড়ি। স্কুল সার্টিফিকেটে আমার জন্মতারিখ হল ২রা জানুয়ারি ১৯৫১”[১]। পিতামহ কৃষ্ণকমল চক্রবর্তীর কাছে পাটিগণিত ও সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে নামি স্কুলে ভর্তি করার, তাই ক্লাস এইট উত্তীর্ণ হয়ে নাইনে ওঠার পরিবর্তে পুনরায় ক্লাস এইটে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা এবং প্রাইভেটে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় কাকার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পটি শুনেছিলেন। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গল্পের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, শুধু তাই নয় সুকুমার রায় ও নজরুল ইসলামের কবিতা পড়তেও ভালোবাসতেন। ছন্দে-ছন্দে মেলানো কবিতার প্রতি আকর্ষণ থাকার জন্যই কবিতা লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ লক্ষ করা যায়, তিনি বলেছেন— “ভেবেছিলাম কবি-সাহিত্যিক যা হোক কিছু হতে হবে। কবিতা লেখাটাই সহজ। মিলিয়ে দিলে হল। একটি কবিতার খাতা করেছিলাম। ঝড় উঠেছে আজ করবো না আর কাজ...”[২]। কিন্তু পরবর্তীকালে কবিতার চেয়ে গল্প রচনার দিকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। ছন্দের মিল থেকে বাস্তব জীবন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ভূমিরাজস্ব দপ্তরে যুক্ত থাকার জন্য তাঁকে গ্রাম-গঞ্জেও পাড়ি দিতে হয়েছিল বারবার; ফলে প্রান্তিক ও উপেক্ষিত মানুষের জীবনযন্ত্রনা এবং কাদামাটিমাখা গ্রাম বাংলার মানুষের কথা, তাদের বেকারত্ব ও দরিদ্রতাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। চোখে দেখা এসব বিষয়গুলি উপেক্ষা না করে বাক্যর পর বাক্য সাজিয়ে গদ্যর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তখনও তিনি পাঠকের কাছে অপরিচিত মুখ,

স্বপ্নময় হয়ে ওঠেননি। পিতৃদত্ত নাম স্বপন চক্রবর্তী নামেই লেখালেখি করতেন, তখন 'বাঁধানো দাঁত' নামক একটি গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। একই নামের অন্য ব্যক্তি গল্পটি তাঁর লেখা বলে দাবি করার ফলে স্বপন নামটি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন– "আমি ১৯৭২ সাল নাগাদ নামটা পাল্টে নিলাম। স্বপ্নময় চক্রবর্তী হলাম"[৩]। আর এই নামেই তিনি একাধিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন, তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' ১৯৯২ সালে 'আনন্দ বাজার'-এ প্রকাশ পায়; পরে দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৫ সালে প্রকাশ করে। বাস্তুত্যাগ ও রিফিউজির কথা আছে 'বাস্তুকথা' (১৯৯৯) উপন্যাসে, 'অবন্তীনগর' (২০০১), আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'হলদে গোলাপ' (২০১২-১৩) তৃতীয় লিঙ্গের বিষয় নিয়ে লেখা। ২০২৩ সালে 'জলের উপর পানি' -র জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

শিক্ষা বলতে বোঝায় কোন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য অভ্যাস বা চর্চা, অর্থাৎ শিক্ষা প্রচলিত অর্থে শেখা। অন্যদিকে, দেশজ বলতে দেশ থেকে জাত যে শিক্ষা অর্থাৎ দেশীয় মানুষের দ্বারা দেশীয় মাটিতে গঠিত ও পরিচালিত এবং যেখানে দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশীয় লোকেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাই হলো দেশজ শিক্ষা। অতএব বলা যায়, যে শিক্ষা অন্য কোন দেশ থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, যা এই দেশেরই মাটিতে গড়ে উঠে এবং মাতৃভাষায় যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাই হল দেশজ শিক্ষা।

দেশজ শিক্ষা প্রধানত দুটি ধারার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। প্রথমত, নিম্নশ্রেণির মানুষের পড়া-লেখা আর অংক শেখার ধারা, যা পাঠশালা ও মক্তবের উপর নির্ভরশীল ছিল। এগুলি মূলত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত থাকতো এবং যা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পেশায় পারদর্শী হতে, অর্থের হিসাব রাখতে, ঠগ ও জুয়াচুরির হাত থেকে রেহাই পেতো সাহায্য করতো। অন্যদিকে মক্তবগুলি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রিক, যেখানে অনন্যা পড়ালেখার থেকে কোরআন শিক্ষার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হতো। তাই বলা যায়, মক্তবগুলি ধর্মীয় প্রভাবাধীন কিন্তু পাঠশালাগুলি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। দ্বিতীয়ত, উচ্চবর্ণ শ্রেণির মানুষের সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি শিক্ষাধারা, যা চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল। সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উচ্চ বর্ণের মানুষ তথা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, আর আরবি শিক্ষা ছিলো মুসলমানদের। অন্যদিকে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে রাজকার্যে যুক্ত হওয়ার জন্য ফারসি শিক্ষা লাভ।

ব্রিটিশ শাসনকালেও বহু বছর ধরে বাংলায় দেশজ শিক্ষা ধারা চালু ছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনের স্বার্থে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন জরুরী হয়ে উঠে। তাই ভারতে ইংরেজি শিক্ষার জন্মদাতা চার্লস গ্রান্ট আঠারো শতকের শেষদিকে নতুন পরিকল্পনা হাজির করেছিলেন। এর ফলে দুটি দলের সৃষ্টি হয়; একদিকে ওরিয়েন্টালিস্ট, তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে ব্রিটিশদের এদেশে থাকতে হলে তাদের ভারতীয় ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে, অ্যাংলিসিস্টসরা পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা

ব্যবস্থার সমর্থন করেছিলেন। বহুদিন ধরে বিতর্কিত এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন লর্ড ব্যাবিংটন মেকলে, তিনি অ্যাংলিসিস্টসের মতবাদকে সমর্থন করে চার্লস গ্রান্টের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেন। পরমেশ আচার্য তাঁর 'বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা' গ্রন্থে লিখেছেন, "গ্রান্ট, মেকলে, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কিন্তু একেবারে খোলনলচে পাল্টে পুরোপুরি পশ্চিমি মডেল এদেশে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন। তাঁরা দেশজ শিক্ষাধারাকে সবদিক দিয়েই অকেজো মনে করতেন। কারণ এরা প্রধানত দেশের উপরতলার লোকের শিক্ষা বিষয়েই বেশি মনোযোগী ছিলেন"[৪]। আর এভাবেই দেশজ শিক্ষার কোমর ভেঙে গেল, হারিয়ে গেল দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি - অবসান ঘটলো একটা যুগের।

জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বর্তমানে শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দের বিষয় নির্বাচন করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে থাকে। কিন্তু প্রাচীনকালে শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীত রূপ আমাদের চোখে পড়ে, যেখানে বর্ণ ও লিঙ্গভেদের প্রভাব স্পষ্ট। বর্ণেভেদের কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র শ্রেণির মানুষরা সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পৃথকভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার পেলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে শূদ্ররা বঞ্চিত হত; তাই শূদ্রদের উপনয়ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার অনুমতি ছিল না। অন্যদিকে বঞ্চিত নারীদের কথাও উপেক্ষা করা যায় না ।

প্রাচীন শিক্ষাধারার একটি বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল চতুষ্পাঠী। চতুষ্পাঠী, চারটি পাঠ অর্থাৎ যেখানে প্রধান চারটি বিষয় যথা – বেদ, কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা থাকতো। সম্পূর্ণভাবে মুখস্থনির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থার জ্ঞান অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য নয়, পাশাপাশি নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুচরিত্র গঠনে ও ধর্মের নানা বিষয়ে পারদর্শী হতে সাহায্য করতো প্রতিটি গ্রামে-গ্রামে, যেখানে ২০-২৫টি ব্রাহ্মণ পরিবার একসাথে বাস করতো সেখানেই গড়ে উঠতো চতুষ্পাঠী। বিশেষ করে লোকালয়, মঠ, মন্দির বা কখনো বাড়ির বারান্দাকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো । চতুষ্পাঠী হলো সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে ছাত্রদের কাছে কোনোরকম অর্থ দাবি করা হতো না।

তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী'-র বিষয়বস্তুর উপর স্বপ্নময়ের ব্যক্তি জীবনের ছায়া স্পষ্ট। বাগবাজারের যে বাড়িতে তাঁরা ভাড়া থাকতেন তার পাশে শিখাদের পরিবার, নীচে তলার কালির কারখানা, নিজের পৈতে অনুষ্ঠান, অসীম এবং অনঙ্গমোহন সবই নিজের চোখে দেখা বিষয়। কলেজস্ট্রিটে বই বিক্রেতার সাথে 'শ্রীহর্ষ চরিত' বই নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা ধুতি পরা, গায়ে চাদর জড়ানো এক বৃদ্ধ লোক তাঁর উপন্যাসে অনঙ্গমোহন হয়ে উঠেছেন, তিনি জানিয়েছেন- "উনিই আমার 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের অনঙ্গমোহন...আমার বাবার মামা হন তিনি...পূর্ব বাংলার বাস্তুচ্যুত একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। যিনি নিজেকে অধ্যাপক ভাবেন। তাঁর জীবন সংগ্রাম, সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সংস্কৃত ক্রমশ মার খাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে। প্রিয় মানুষের

মৃত্যুর মতো সংস্কৃতকে দেখেছেন”[৫]। আলোচ্য প্রবন্ধে মার খাওয়া, অকেজো হয়ে পড়া সংস্কৃত ভাষা ও চতুষ্পাঠীর কথায় তুলে ধরা হয়েছে।

উপন্যাসটির মূল চরিত্র অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি নদীর মতো বয়ে চলেছে তিনি হলেন অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য একজন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। তাঁর পিতা নীলকমল ভট্টাচার্য কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ছাড়াও স্মৃতিতীর্থ উপাধি লাভ করেছিলেন এবং তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল পূর্ণচন্দ্রের চতুষ্পাঠী। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র অনঙ্গমোহনের উপর চতুষ্পাঠী পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। একসময় তিরিশজন ছাত্র পড়ত এই টোলে, কিন্তু কর্মমুখী শিক্ষার ফলে পরবর্তীকালে মাত্র চার-পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীই ছিল টোলের সম্বল। যেখানে কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ এবং দর্শন চারটি শাখাই পড়ানো হতো। ধ্বনিবিজ্ঞান, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ভরপুর সংস্কৃত মেকলে প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে ম্লান হয়ে পড়েছে। পণ্ডিতের ঘরের সন্তান চতুষ্পাঠীতে পড়বে এবং সেই শিক্ষায় হবে প্রকৃত শিক্ষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কৃত্রিম নিয়েম আবদ্ধ অন্তপুরের কুলবধূদের শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন নীলকমল, তাঁর মতে নটী-বারাঙ্গনা নারীদের শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠে যে মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, গার্গী-রাও তো কুলবধূ। তাই জমিদার নলিনীকান্ত শূর নিজ উদ্যোগে বেথুন কলেজ পাস পুত্রবধূকে নিয়ে পাঠশালা শুরু করলেন এবং কায়স্থ বাড়ি, বৈদ্য বাড়ির মেয়েরা পাঠশালায় অংশগ্রহণ করলেন। নলিনী শূরের ম্যাট্রিক পাস পুত্রবধূ আধুনিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিলেন, পাঠশালায় বাংলা-সংস্কৃত নয় ইংরেজি ধ্বনির গুঞ্জন শোনা গেল। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি এই অনীহা, বক্র মনোভাব নীলকমলকে আঘাত করেছে; তাই তিনি বলে উঠেছেন —

“শূর বাড়িতে এখন আসুরিক কাজকর্ম। নামে পাঠশালা, আসলে ইংরেজি ইস্কুল।
একদিন দুপুরে শূরবাড়ি থেকে কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে, কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্যের পরিবর্তে শোনা গেল—

ত্রিশদিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর
সে রূপ এপ্রিল জুন আর নভেম্বর

এবং সবচেয়ে বড় কথা পার্শ্ববর্তনীরা একদিন গাইল—

পামকিন চালকুমড়ো কুকুম্বার শশা
কাম-ইন ভিতরে আসা সিট-ডাউন বসা ।

... ম্যাম তৈরি হইতাছে? ম্যামের কারখানা?”[৬]

ম্যামের কারখানায় বাংলা, সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে ইংরেজি শব্দ নির্বাচন ও প্রচারে আহত নীলকমলের ক্ষোভের মুখে পড়েছে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনকারী মেকলে। তাই অনঙ্গমোহনের পিতার কাছে আধুনিক শিক্ষা ম্লেচ্ছ মনে হয়েছে, তিনি বলেছেন যে- “মেকলে প্রবর্তিত ঐ ম্লেচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থায় অনাবশ্যক পাশ্চাত্য অনুরাগ জন্মে। ইংরাজের হীন অনুকৃত কিছু কুষ্মাণ্ড তৈরী হয়”[৭]। দেশীয় মানুষরা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে

অবমাননা করে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়ে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। যারা পশ্চিমা ভাষা ও সংস্কৃতিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে তারাই আসল কুষ্মাণ্ড, তারা উপরে ইংরেজ কিন্তু ভিতরে ফাঁপা। তাই তারা নিজেদের না সম্পূর্ণ ইংরেজ করে তুলতে পারবে, না ভারতীয়।

পিতাকে নিজের জীবনের আদর্শ মেনে তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে পরিচালনা করেছেন অনঙ্গমোহন। পিতার মতোই সমগ্র জীবনকে সংস্কৃত ভাষা আর চতুষ্পাঠীর জন্য উৎসর্গও করেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষা কালজয়ী এবং চতুষ্পাঠীও যুগে যুগে বহমান; সংস্কৃতর আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই, জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু নেই—

"...সংস্কৃত সহজে মরবে না, মরতে পারে না ।
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ যাবদ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ
যাবদ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ।
যতদিন গঙ্গা গোদাবরী, ততদিন সংস্কৃত ভাষা আছে"[৮]

আধুনিক শিক্ষা নয়। শিক্ষার ধারার মধ্যেই আছে জীবনের গভীর সত্য— আর এই সত্যকে অনুসরণ করা অনঙ্গমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস সংস্কৃত ও সংস্কৃতির উপর, যা একমাত্র মুক্তির পথ। কিন্তু, সেই সত্য আর মুক্তির পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সংসারের অভাব-অনটন। তাই অর্থ সংকটে পড়ে অনুশোচনা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে টোল ও চতুষ্পাঠী চালানোর থেকে স্কুলের পণ্ডিত হলে অর্থ ও সম্মান দু'ই অর্জন করা যায়, তিনি বলেছেন— "ইশরে, এখন স্কুলের পন্ডিতেও দেড়শো টাকা পায়"[৯]। অর্থাৎ হতাশাগ্রস্ত অনঙ্গমোহনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করেছেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতিবৃত্তি, ইস্কুলের পণ্ডিতের কাছে ম্লান হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনঙ্গমোহন নিজে সরকারি ভাতা পান চার টাকা, আর এই চার টাকায় তাঁর একমাত্র সম্বল।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে অনঙ্গমোহনের এই অনুশোচনা ও আত্মদ্বন্দ্বর অর্থ বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। একদিকে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু, বৌমার কাজ চলে যাওয়া, সংসারে অর্থাভাব অন্যদিকে জেলায় জেলায় মেকলের ইংরেজি স্কুল ও চতুষ্পাঠীর সংকটময় ভবিষ্যতে ক্ষতবিক্ষত অনঙ্গমোহন কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার ফলস্বরূপ পূর্ণচন্দ্রর চতুষ্পাঠী ছাত্র তৈরির পরিবর্তে ঠোঙা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। যে চতুষ্পাঠী নৈতিক শিক্ষা, শাস্ত্র শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের সুচরিত্র গঠন ও ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতো, সেখানে দক্ষতার সাথে ঠোঙা তৈরি হতে লাগলো। কাব্যচন্দ্রহার, অলংকার শাস্ত্র, পঞ্জিকা, রাশিফল ছিঁড়ে ফেললেন অনঙ্গমোহন— এতো অনভিপ্রেত ঘটনা। কখনো তিনি সংস্কৃত আর সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন, আবার কখনো তিনি সংস্কৃত আর সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন—

"... শাস্ত্রের পায়ুমেহন করি আমি... এই বলেই দেওয়ালের পাশে বইয়ের তালিকায় লাথি মারলেন তিনি। ছিটকে পড়ল কাব্য চন্দ্রসুধা—নৈষধ চরিত—কাদম্বরী। তক্ষুণি আবার গিয়ে তুলে নিলেন। চাদরে মুছলেন। ছিঁড়ে যাওয়া পাতাটিকে শুশ্রূষা করলেন অনঙ্গমোহন। হাত বুলোলেন। বাছা, সংস্কৃত ভাষা।"[১০]

সংস্কৃত ও চতুষ্পাঠী নির্ভরশীল অনঙ্গমোহন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সংশয় প্রকাশ করেছিল নিজের শিক্ষা ও কর্মবৃত্তির উপর। সমগ্র জীবনে সংস্কৃত ভিন্ন অন্যকিছু ভালোবাসেননি অথচ সংস্কৃতর কোনো বিনিময় মূল্য তিনি পেলেননা। চার টাকার টুলা পণ্ডিত হয়েই তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার কাছে দেশজ শিক্ষা ধারার টোল, চতুষ্পাঠী বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা অসহায় হয়ে পড়েছিল। ঠিক তেমনি সুন্দর ও গতিশীল পৃথিবীতে এবং ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজে অনঙ্গমোহনও অসহায় হয়ে পড়েছিল। সংস্কৃত মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ করে অর্থ আয় করার চেষ্টা ও ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃততে এম.এ করা অধ্যাপকদের কাছেও নিজের মূল্য না পাওয়ার বেদনা তাকে মর্মাহত করেছে। অনঙ্গমোহনের মনে হয়েছিলো পাণিনি, মনুসংহিতা, পরাশর, নৈষধের পদললিতা, যমক-অনুপ্রাস, সমাস সবই মিথ্যা; জীবন নির্বাহে অনাবশ্যক, সাধারণ জীবনযাত্রায় কোনো কাজেই আসে না—

"টুলা পণ্ডিতের সন্তান না হইতাম যদি, জিলাপি বানাইতে পারতাম যদি, ফুলুরি, বেগুনি, যদি রিকশাচালক হইতাম, গলায় গামছা, সাংখ্য না পড়তাম যদি, যদি না পড়তাম জৈমিনি সংহিতা, পূর্ব মীমাংসা, ঘটের মধ্যে, তিন আনার ঘটের মধ্যে যদি আবাহন করতে পারতাম ঐরাবত সমেত ইন্দ্রদেব, যদি হীং মন্ত্রে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম মৃন্ময় পুত্তলের, যদি হাতে সাজি আর ফুল লইয়া দোকানে দোকানে ফুল ছিটাইতে পারতাম, দোকান মালিকের কপালে পরাইয়া দিতে পারতাম, যদি দশনয়ার চন্দন তিলক, টাকার ড্রয়ারে যদি ছিটাইতে পারতাম গঙ্গাজল, বিন্দু, কুটনী হইতাম যদি, যদি হইতাম বেশ্যার দালাল, উঃ, কলের মিস্ত্রিও যদি হইতাম..."[১১]

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা তৃতীয় ব্যক্তি হলেন পুরোহিত, যারা সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে উপবিষ্ট। তাঁদের একমাত্র জীবিকা পূজাপাঠ, পাশাপাশি টোল ও চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু, ব্যাবিংটন মেকলের শিক্ষানীতির প্রভাবে সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব কমতে থাকে এবং টোল ও চতুষ্পাঠীর পঠনপাঠন ম্লান হতে থাকে। মন্দা পড়ে উপার্জনে, সামাজিক মান-মর্যাদা হ্রাস পায়। কেননা অর্থনৈতিক অবস্থান সামাজিক মানদণ্ডের মাপকাঠি। অনঙ্গমোহন নিজেকে কখনো আবর্জনা ভেবেছেন, আবার কখনো পৃথিবীতে অনাবশ্যক বলে মনে করেছেন। তাই শেষদিকে অনঙ্গমোহনের মুখে অসীমের ভবিষ্যত সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ শোনা যায়— "পড়াশোনা ছাড়িস না। সংস্কৃত না পড়িস – না পড়িস, ইংরেজি পড়িস, অঙ্ক করিস"[১২], তাঁর এই যন্ত্রনা পাঠক মনকেও বিচলিত করে তোলে। সংস্কৃতকে প্রাণ মনে করা অনঙ্গমোহন শেষ পর্যন্ত অঙ্ক ও ইংরেজির পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্বামী জগদীশ, দুই সন্তান ও অনঙ্গমোহনকে নিয়ে অঞ্জলির সংসার। জগদীশ, পিতা অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীর পাঠ ছেড়ে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার বায়না করেছিলন এবং স্কুল থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ নিয়েছিলেন, শিখেছিলেন টাইপ রাইটিংও। ফলে প্রথম দিকে মাছের গুদামে ও পরে টিনবকস ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিতেও কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ সংসারে অন্ধকার নেমে আসে স্বামী জগদীশের অকস্মাৎ মৃত্যুতে। ফলে একটা গোটা পরিবার অভাবের কুয়োতে তলিয়ে যায়। তাই নিজের পরিবারকে বাঁচাতে অঞ্জলি একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; সমাজের সকল বাঁধাকে অতিক্রম করে, অনঙ্গমোহনের মতামত উপেক্ষা করে টিনবকস ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিতে কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে অন্যের বাড়ির রাঁধুনি হতেও দ্বিধাবোধ করেননি সে। চোখের সামনে দেখেছেন সংসারের করুণ অবস্থা, অনুভব করেছেন সংসারে অভাব-অনটন, উপলব্ধি করেছেন কর্মসংস্থানের সংকটকে। অন্যদিকে অনঙ্গমোহনের জীবনযুদ্ধের সাক্ষীও থেকেছেন অঞ্জলি। তাই নিজের সন্তান বিলুর ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি চেয়েছেন আগামী প্রজন্ম অভাবের বেড়াজাল ভেদ করে সুখের সংসারে পদার্পন করুক। তাই তাঁর মনে হয়েছে চতুষ্পাঠী শিক্ষার কোনো মূল্য নেই, সমাজে টিকে থাকতে হলে নতুন পথের পথিক হতে হবে। সংস্কৃত আর সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে, আধুনিক শিক্ষাকে বর্জন করে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিজ সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন। জীবনের কাটাকুটির হিসাব মিলিয়ে দিতে মা অঞ্জলি সন্তান বিলুকে অঙ্কর উপর জোড় দিতে বলেছেন—

> "কদিন আগে অঞ্জলি বলেছিল বিলুকে, একটা অঙ্কের মাস্টার দ্যাখ। ক্লাস নাইনে উইঠ্যা, সাইন্স পড়বি। সব ভালো ছেলেরা সাইন্স পড়ে। সাইন্স পইড়া চাকরি পায়। চাকরি কইরা তুই সোনা, আমারে সুখ দিবি।"[১৩]

সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত এক মায়ের এই মর্মবাণী নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের কঠিন জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। শাস্ত্র, পুরান ও ব্যাকরণ অধ্যায়ন নয় বরং বিজ্ঞানমুখী ও কর্মমুখী আধুনিক শিক্ষায় সামাজিক উন্নতির একমাত্র পথ। সেজন্য অঞ্জলি চেয়েছেন বিলু সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করুক। আসলে একজন মা সন্তানের সুখের মধ্য দিয়েই নিজের সুখলাভ করে থাকে, ঠিক তেমনি অঞ্জলি সুখলাভ করতে চেয়েছেন পুত্র বিলুর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সন্তানের মঙ্গল কামনা ছাড়া একজন মা আর কিইবা চাইতে পারেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ঈশ্বরী পাটনি মা অন্নপূর্ণার কাছে নিজের জন্য নয়; বর চেয়েছিলেন সন্তানের জন্য, যেন তাঁর সন্তান দুধ ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে। ঠিক তেমনি অঞ্জলিও চেয়েছেন নিজ সন্তান বিলু যেন ভবিষ্যতে দুধ ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, আর তার একমাত্র পথ আধুনিক শিক্ষা।

অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীর একমাত্র কৃতি ছাত্রী শ্রীমতি সুমিতা দত্ত এবং সে কাব্য-উপাধি পরীক্ষার্থীনী। কৃতি সুমিতাই 'পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী'র একমাত্র ভরসা কারণ উপাধি পাস করে সে কাব্যতীর্থ হবে, তাই তাঁকে নিয়ে অনঙ্গমোহনের অনেক স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হয়নি, ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে সুমিতার বিবাহ স্বপ্ন আর বাস্তববের মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে চতুষ্পাঠীতে তাঁকে আর দেখা যায়নি। শ্বশুবাড়ির ইচ্ছা বাড়িতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তৈরি হবে, যেখানে জ্যাক অ্যান্ড জিল ও হাম্পটি ডাম্পটি ইংরেজি কবিতা মুখস্থ করানো হবে। সেখানে শিক্ষিকা হবেন সুমিতা। সংস্কৃতর ছাত্রী পড়াবেন ইংরেজি, শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছাকেই আদর্শ বৌমার মতো মেনে নিলেন প্রতিবাদ বিমুখ সুমিতা—

> "টাইনি টটস। দি আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন স্কুল ফর চিলড্রেন। অ্যাডমিশন গোয়িং অন। কন্ট্যাক্ট মিস জিজা রায়/মিসেস সুমিতা মিত্রা।"[১৪]

কী আশ্চর্য এই পরিবর্তন! চতুষ্পাঠী থেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল টাইনি টটস, সংস্কৃতর ছাত্রী 'শ্রীমতি সুমিতা' থেকে ইংরেজি মিডিয়ামের শিক্ষিকা 'মিস সুমিতা'— যা একটা ধারা ও যুগের পরিবর্তনকে সূচিত করে ।

পরিশেষে বলা যায় যে, আলোচ্য উপন্যাসটি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও ঘটনা বিন্যাসে অভিনবত্ব লাভ করেছে। অতীতকে আঁকড়ে ধরলে যেমন বর্তমানে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি দেশজ শিক্ষার শিকড়কে আঁকড়ে ধরলে ভবিষ্যতের পথে অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে উঠে। অন্যদিকে, বর্তমানকে অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার ধারাকেও উপেক্ষা করা যায় না। এ কেবল অতীত আর আধুনিকতার দ্বন্দ্ব নয়, বরং নতুন ভাবনার পথ হিসাবে আলোচিত হয়েছে। দেশীয় শিক্ষার ঐতিহ্য ও শিক্ষন পদ্ধতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাই ভবিষ্যতে নব পথের সূচনা করবে ।

তথ্যসূত্র—

১) চক্রবর্তী স্বপ্নময় : 'জীবন ভ্রমণ', 'পথ সাহিত্য পত্রিকা', স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা, মনোরঞ্জন সরদার (সম্পা), একাদশ বর্ষ, জুলাই-২০১৮, কলকাতা-৪৪, পৃ- ৭
২) তদেব, পৃ- ১৬
৩) চক্রবর্তী স্বপ্নময়, 'আমার প্রথম বই', 'যাপনচিত্র', বর্ণালী রায় (সম্পা), বইমেলা ২০১৭, কলকাতা- ৯, পৃ- ১৬৬
৪) আচার্য পরমেশ। বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা (১ম খন্ড)। কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ: ১৩৭২. পৃ- ৮
৫) চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। ধানাই পানাই। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫। কলকাতা- ৫৯, পৃ- ১২৫
৬) চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। চতুষ্পাঠী। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশ কাল ১৯৯৫, পৃ- ৫৫
৭) তদেব, পৃ-৪২
৮) তদেব, পৃ- ২৫
৯) তদেব, পৃ- ১২
১০) তদেব, পৃ- ১৬২
১১) তদেব, পৃ- ১৩৩

১২) তদেব, পৃ- ১৪৯
১৩) তদেব, পৃ- ১৫৭
১৪) তদেব, পৃ- ১৮১